"মিষ্টি বাচ্চারা -- অপার খুশী বা নেশায় থাকতে হলে দেহ-অভিমানের রোগ পরিত্যাগ করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হও, নিজের আচার-আচরণ শুধরে নাও"

***প্রশ্নঃ -** কোন্ বাচ্চাদের উল্টো (ভুল) জ্ঞানের নেশা চড়ে না ?*

***উত্তরঃ -** যারা বাবাকে যথার্থভাবে জেনে স্মরণ করে, অন্তর থেকে বাবার মহিমা করে, যাদের পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রয়েছে তাদের উল্টো জ্ঞানের নেশা চড়তে পারে না। যে বাবাকে সাধারণ মনে করে সে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। যদি স্মরণ করে তবে সমাচারও বাবাকে অবশ্যই দেবে। সন্তান যদি সমাচার না দেয় তখন বাবাও মনে করে যে, বাচ্চা! কোথাও মুর্ছিত (অজ্ঞান) হয়ে গেলো না তো ?*

ওম্ শান্তি। বাবা বসে-বসে বাচ্চাদের বোঝান -- বাচ্চা, যখন নতুন কেউ আসে তখন তাদের প্রথমে সসীম (হদ) আর অসীম(বেহদ), দু'জন পিতার পরিচয় দাও। অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ অসীম জগতের আত্মাদের পিতা। আর পার্থিব জগতের পিতা, যা প্রত্যেক জীবাত্মারই আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। এই নলেজও সকলে একইরকমভাবে (একরস) ধারণ করতে পারে না। কেউ এক শতাংশ, কেউ ৯৫ শতাংশ ধারণ করে। এ তো বুদ্ধিমত্তার কথা, সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় কুল, তাই না। রাজা-রানী যেমন প্রজাও তেমন। প্রজাতে সবরকমের মানুষ থাকে। প্রজা অর্থাৎ প্রজাই। বাবা বোঝান যে, এ হলো পঠন-পাঠন, প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী পড়ে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ ভূমিকা রয়েছে। যে কল্প-পূর্বে যতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, এখনও ততটাই করবে। পড়াশোনা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। পড়া অনুসারেই পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা বোঝান, ভবিষ্যতে পরীক্ষাও হবে। পরীক্ষা ব্যতীত ট্রান্সফার হতে পারে না। ভবিষ্যতে সবই জানতে পারবে। কিন্তু এখনও তোমরা জানতে পারো যে, আমরা কোন্ পদের যোগ্য হয়েছি ? লজ্জায় অবশ্য সকলেই হাত তোলে কিন্তু তারা জানে যে, এভাবে আমরা কিভাবে হতে পারব ! তথাপি হাত ওঠায়। একেও তো অজ্ঞানতাই বলা হবে। বাবা তো তৎক্ষণাৎ বুঝে যায় যে, বেশী বুদ্ধি লৌকিক স্টুডেন্টদের থাকে। ওরা মনে করে যে, আমরা স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য নই, পাশ করতে পারবো না। তারা মনে করে, টিচার যা পড়ায় তাতে আমরা কত মার্ক্স পাব ? এখন কি বলবে যে, আমরা পাস-উইথ-অনার হব। এখানে তো অনেক বাচ্চাদের মধ্যে এতটুকুও বুদ্ধি নেই, দেহ- অভিমান অনেক। অবশ্যই এসেছে এমন (দেবতা) হওয়ার জন্য কিন্তু চাল-চলনও তো এমন চাই। বাবা বলেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির কারণ নিয়মানুসারে সঠিকভাবে বাবার সঙ্গে ভালবাসা থাকে না।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝান যে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির যথার্থ অর্থ কী ? বাচ্চারাই পুরোপুরি বুঝতে পারে না তাহলে ওরা কী বুঝবে ? বাবাকে স্মরণ করা -- এ হলো গুপ্ত কথা। পড়া (জ্ঞান) তো গুপ্ত নয়, তাই না। নম্বরের ক্রমানুসারে পঠন-পাঠন হয়। সকলে একইভাবে কী পড়বে, না পড়বে না। বাবা জানেন, এখনও এরা বেবী (বাচ্চা)। এমন অসীম জগতের পিতাকে তিন-তিন, চার-চার মাস স্মরণও করে না। কীভাবে জানা যাবে যে, স্মরণ করে ? বাবাকে পত্র পর্যন্ত লেখে না যে, বাবা আমি কিভাবে চলছি, কী-কী সার্ভিস করছি ? বাবার বাচ্চাদের জন্য কত চিন্তা থাকে যে, কোথাও বাচ্চা (আমার) অজ্ঞান হয়ে গেল না তো, কোথাও বাচ্চা মরে যায় নি তো ? কেউ-কেউ তো বাবাকে কত সেবা-সমাচার লেখে। বাবাও বোঝে যে, এই বাচ্চারা জীবিত। সেবাধারী বাচ্চারা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ের কথা জানে যে কোন্ বাচ্চা কেমন ? দেহ-অভিমানের রোগ বড় কড়া। বাবা মুরলীর মাধ্যমে বোঝান, অনেকের তো আবার জ্ঞানের উল্টো নেশা চড়ে, অহংকার চলে আসে তখন আর স্মরণ করে না, পত্রও লেখে না। তাহলে বাবাও তখন স্মরণ কীভাবে করবে ? স্মরণের দ্বারাই স্মরণ মিলিত হয়, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে যথার্থ ভাবে জেনেই স্মরণ কর, অন্তর থেকে মহিমা করে, অনেক বাচ্চারা বাবাকে সাধারণ মনে করে তাই স্মরণ করে না। বাবা কি কোনো আড়ম্বরাদি দেখাবে, না দেখাবে না। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব দেওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাই। তোমরা কি বোঝ যে আমরা বিশ্বের রাজত্ব নেওয়ার জন্য অসীম জগতের বাবার কাছে পড়ছি। এই নেশা যদি থাকে, তবে অগাধ খুশীর পারদ সর্বদা চড়ে থাকবে। গীতা পাঠকারীরা অবশ্য বলে যে -- শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আমি রাজযোগ শেখাই, ব্যস। তাদের রাজত্ব পাওয়ার খুশী কি থাকবে, না থাকবে না। গীতা পড়ে শোনায় আর নিজ-নিজ কাজকর্মে পুনরায় লেগে পড়ে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে যে, আমাদের অসীম জগতের পিতা পড়ায়, তাদের এমন কথা বুদ্ধিতে আসবে না। তাই প্রথমে যখন কেউ আসবে তখন তাদের দু'জন পিতার পরিচয় দাও। বলো, ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক। এ হলো

কলিযুগ, একে কি স্বর্গ বলবে, না বলবে না। এমন কথাও বলবে না তো যে, সত্যযুগেও আছে, কলিযুগেও আছে। কেউ দুঃখ পেলে বলা হবে যে, নরকে রয়েছে, কেউ সুখে থাকলে বলবে স্বর্গে রয়েছে। এমন অনেকেই বলে যে -- দুঃখী মানুষ নরকে থাকে, আমরা তো এখন অনেক সুখে বসে রয়েছি। মহল, মোটরাদি রয়েছে, মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছি। স্বর্ণযুগ, লৌহযুগ সব একই ব্যাপার।

তাই সর্বপ্রথমে দু'জন পিতার (লৌকিক-পারলৌকিক) কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। স্বয়ং বাবা-ই নিজের পরিচয় দেন। তিনি সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ? লৌকিক পিতাকে কী সর্বব্যাপী বলবে ? এখন তোমরা চিত্রতে দেখাও যে, আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ তো একই, এরমধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আত্মা-পরমাত্মা কোনো ছোট-বড় হয় না। সবাই আত্মা, তিনিও আত্মা। তিনি সদা পরমধামে থাকেন সেইজন্য তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। শুধুমাত্র তোমরা আত্মারা যেভাবে আসো সেভাবে আমি আসি না। আমি অন্তিম সময়ে এই শরীরে এসে প্রবেশ করি। এইকথা কোনো বাইরের মানুষ বুঝতে পারে না। বিষয় অত্যন্ত সহজ। পার্থক্য শুধু এটাই যে, বাবার বদলে বৈকুন্ঠবাসী কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ কি বৈকুন্ঠ থেকে নরকে এসে রাজযোগ শিখেছে ? কৃষ্ণ কীভাবে বলতে পারে যে, দেহ-সহ দেহের সরল সম্বন্ধকে ভুলে একমাত্র (মামেকম্) আমাকে স্মরণ করো। দেহধারীকে স্মরণ করে পাপ কীভাবে খন্ডিত হবে ? কৃষ্ণ তো ছোট শিশু আর কোথায় আমি এক সাধারণ মানুষের বৃদ্ধ (পুরানো) শরীরে আসি। কত পার্থক্য হয়ে যায়। এই একটি ভুলের কারণে সকল মানুষ পতিত, কাঙ্গাল হয়ে গেছে। না আমি সর্বব্যাপী, না কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, না প্রত্যেকটি শরীরে আত্মা সর্বব্যাপী। আমার তো নিজস্ব শরীরও নেই। প্রত্যেক আত্মার নিজ-নিজ শরীর আছে। প্রত্যেক শরীরের পৃথক-পৃথক নাম থাকে। না আমার শরীর আছে আর না আমার শরীরের কোনো নাম আছে। আমি বৃদ্ধশরীর ধারণ করি, তাই এঁনার নাম বদলে ব্রহ্মা নাম রেখেছি। আমার নাম তো ব্রহ্মা নয়। আমাকে সদা শিবই বলা হয়। আমিই সকলের সদ্গতিদাতা। আত্মাকে সকলের সদ্গতিদাতা বলা হবে না। পরমাত্মার কখনো দুর্গতি হয় কি ? আত্মারই দুর্গতি আর আত্মারই সদ্গতি হয়। এসবই বিচারসাগর মন্থন করার মতো বিষয়। তা নাহলে অন্যদের কীভাবে বোঝাবে। কিন্তু মায়া এত প্রবল যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অগ্রসর হতে দেয় না। সারাদিন ব্যর্থ আলাপে সময় নষ্ট করে দেয়। বাবার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মায়া কত ধাক্কা (ফোর্স) দেয়। তখন অনেক বাচ্চা ভেঙ্গে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করার জন্য অবস্থা অটল-সুদৃঢ় হয় না। বাবা প্রতি মুহূর্তে খাঁড়া করিয়ে দেন, আর মায়া ফেলে দেয়। বাবা বলেন, কখনো পরাজিত হয়ো না। প্রতি কল্পেই এমন হয়, এ কোনো নতুন কথা নয়। অন্তে মায়াজীত হয়েই যাবে। রাবণ রাজ্যকে সমাপ্ত হতেই হবে। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করব। প্রতি কল্পে মায়াজীত হয়েছি। অনেকবার নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করেছি। বাবা বলেন, বুদ্ধিকে সদা ব্যস্ত রাখো, তবেই সুরক্ষিত থাকবে। একেই স্বদর্শন-চক্রধারী বলা হয়, এছাড়া এখানে হিংসা ইত্যাদির কোন কথাই নেই। ব্রাহ্মণই স্বদর্শন-চক্রধারী হয়। দেবতাদের স্বদর্শন-চক্রধারী বলে না। পতিত দুনিয়ার রীতি-রেওয়াজ আর দেবী-দেবতাদের রীতি-রেওয়াজের মধ্যে অনেক পার্থক্য। মৃত্যুলোক-নিবাসীরাই পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র কর। পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে নতুন পবিত্র দুনিয়া ছিল, যাকে সত্যযুগ বলা হয়। ত্রেতাকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন -- ওটা(সত্যযুগ) হলো ফার্স্টক্লাস, এটা হলো সেকেন্ডক্লাস। এক-একটি কথা ভালভাবে ধারণ করা উচিত যেন কেউ এসে শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু তাদের সময় নেই পুরুষার্থ করার। আবার শোনে যে, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এই কাম-বিকারই মানুষকে পতিত করে, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগতজীৎ হয়ে যাবে। কিন্তু কামবিকারই যেন তাদের পুঁজি(ঐশ্বর্য্য), তাই এই ব্যাপারে কথা বলে না। শুধু বলে মনকে বশ কর। কিন্তু মন চিন্তামুক্ত তখনই হয় যখন শরীরে তা থাকে না। এছাড়া মন কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। আত্মা শরীর প্রাপ্ত করে, কর্ম করার জন্য, তাহলে আবার কর্মাতীত অবস্থায় কীভাবে থাকবে ? কর্মাতীত অবস্থা বলা হয় মৃতকে। জীবিত থেকেও মৃত অথবা শরীর থেকে পৃথক। বাবা তোমাদের শরীর(শরীরের ভান) থেকে পৃথক হওয়ার পড়া পড়ান। শরীর থেকে আত্মা আলাদা। আত্মা পরমধাম নিবাসী। আত্মা যখন শরীরে আসে, তখন তাকে মানুষ বলা হয়। শরীর ধারণ করাই হয় কর্ম করার জন্য। এক শরীর পরিত্যাগ করে কর্ম করার জন্য আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। শান্তি তো তখন থাকে যখন শরীরে আত্মা থাকে না। পরমধামে (মুলবতনে) কর্ম হয় না। সূক্ষ্মলোকের তো কথাই নেই। সৃষ্টির চক্র এখানেই আবর্তন করে। বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জেনে যাওয়া, একেই নলেজ বলে। সূক্ষ্মলোকে না শ্বেত বস্ত্রধারী, না সাজ-গোজ, না সর্প দ্বারা সুশোভিত শঙ্করাদি থাকে। বাকি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রহস্য বাবা বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মা এখানে। বিষ্ণুর দুই-রূপও এখানে। ড্রামায় এ শুধু সাক্ষাৎকারের ভূমিকা রয়েছে, যা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখা যায়। কুদৃষ্টি (ক্রিমিনাল) দ্বারা পবিত্র জিনিস দেখা যায় না। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে সদা সুরক্ষিত রাখার জন্য বুদ্ধিকে বিচারসাগর মন্থনে ব্যস্ত রাখতে হবে। স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। ব্যর্থ আলাপে (আড্ডায়) নিজের সময় নষ্ট কোরো না।

২) শরীর থেকে পৃথক হয়ে থাকার জন্য যে পড়া(জ্ঞান), যা বাবা আমাদের পড়ান তা পড়তে হবে। মায়ার ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্থিতিকে অটল-সুদৃঢ় করতে হবে।

বরদানঃ- সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থেকে মন থেকে খুশীর সংগীত গাইতে থাকা অবিনাশী সৌভাগ্যবান ভব*

ব্যাখা:- তোমরা, সৌভাগ্যবান বাচ্চারা অবিনাশী বিধিপূর্বক অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্ত করো। তোমাদের মনে সদা বাঃ! বাঃ! এই খুশীর সংগীতই পরিবেশিত হয়। বাঃ বাবা! বাঃ ভাগ্য! বাঃ মিষ্টি পরিবার! বাঃ শ্রেষ্ঠ সঙ্গমের সুখময় সময় ! প্রতিটি কর্ম বাঃ-বাঃ! তাই তোমরা অবিনাশী সৌভাগ্যবান। তোমাদের মনে কখনও কেন(হোয়াই), আমি (আই) আসতে পারে না। 'কেন'-র পরিবর্তে বাঃ বাঃ আর 'আমি'-র পরিবর্তে বাবা-বাবা শব্দই আসে।

স্লোগানঃ- যে সঙ্কল্পই করো, তাতে অবিনাশী গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দাও, তবেই অটল থাকবে।*